ভূমিকম্প ও বাংলাদেশের অবস্থান

এম এম মাহবুব হাসান

আমরা মাঝে মাঝে অনুভব করি যে, পৃথিবীর কঠিন ভূ-ত্বকের কতক অংশ প্রাকৃতিক কোন কারণে কেঁপে ওঠে। ভূ-পৃষ্ঠের এই আকস্মিক কম্পনকে ভূমিকম্প বলা হয়। এটি একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়। পৃথিবীতে যতগুলো প্রাকৃতিক বিপর্যয় রয়েছে তার মধ্যে ভূমিকম্পের ভয়াবহতা সবচেয়ে বেশি। আর এই ভয়াবহতার প্রধান কারণ আজ পর্যন্ত বিশ্বের বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের পূর্বাভাস আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি। পূর্বাভাস আবিষ্কার হলে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক কমে আসত। তারপরেও বিজ্ঞানীদের ধারণার অন্ত নেই। যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-বিজ্ঞানী রজার বিলহ্যাম এক সমীক্ষায় বলেছেন যে, হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত দেশগুলো প্রবল একটা ভূমিকম্প ঝুকির মধ্যে রয়েছে। উক্ত ভূমিকম্পটি সংঘটিত হলে এ দেশগুলোর ৫ কোটি লোকের জীবননাশসহ বড় বড় শহরগুলো ধ্বংস প্রাপ্ত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তিনি বলেন যেহেতু এসব এলাকায় অনেক বছর তেমন কোন ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়নি, সুতরাং একটি প্রবল ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার জন্য ভূ-অভ্যন্তরে যে পরিমান তাপ ও চাপের প্রয়োজন তা অলরেডি সৃষ্টি হয়ে গেছে এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। তিনি বলেন যে, ‘‘যদিও ভূমিকরম্পর পূর্বাভাস আবিষ্কার হয়নি তবুও আমরা বিজ্ঞানীরা এটা বুঝতে পারি’’। তিনি আরও বলেন, ভারতীয় প্লেটটি একশ বছরে ছয় ফুট করে এশীয় প্লেটের নিচে ঢুকছে। এর অর্থ হচ্ছে যে, ভারতীয় প্লেটের প্রায় ১০ টি ফুটবল মাঠের সমআয়তনের স্থান এশীয় প্লেটের নিচে চলে যাচ্ছে। ফলে চাপ জোর থেকে জোরদার হচ্ছে। এই চাপ বৃদ্ধিই ভূমিকম্পের প্রধান কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। স্প্রিংয়ের মত প্রতিক্রিয়ার যে কোন সময় ভূ-ত্বক কেঁপে উঠতে পারে। আমরা যে একটা বারুদের স্তুপের উপর বসবাস করছি তা বিলহ্যামের বিবৃতিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আজ হোক কাল হোক হিমালয়ের পাদদেশের ১২’শ ৫০ মাইল এলাকা জুড়ে প্রচন্ড ভূমিকম্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। তিনি বলেন, ‘‘যেহেতু জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে সেহেতু ক্ষয়ক্ষতির পরিমানটাও হবে বেশি। তার একটি উদাহরণ থেকে জানা যায় যে, ১৯০৫ সালে ভারতের কাংরা শহরে এক ভূমিকম্পে ১৯ হাজার লোক নিহত হয়। একই মাত্রায় ভুমিকম্প হলে ঐ শহরে এখন মৃতের সংখ্যা হবে ২ লক্ষ। আর হওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন নতুন ইমারতও গড়ে উঠছে যার অধিকাংশই ত্রুটিপূর্ণ।

১৯৮৭ সালে যমুনা সেতু প্রকল্পের কাজের সময় বাংলাদেশ এবং তার পাশের সম্ভাব্য ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলগুলো চিহ্নিত করা হয়। এগুলো হচ্ছে আসাম, ত্রিপুরা, সাব-ডাউকি ও বগুড়া ফল্ট জোন। বাংলাদেশের সবচেয়ে ঝুকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে আসাম জোনের নিকটবর্তী অঞ্চলকে। ১৯৯৩ সালের বিল্ডিং কোড অনুযায়ী বাংলাদেশকে ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবে তিনটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম জোনে রয়েছে- বগুড়া, কুড়িগ্রাম, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, শ্রীমঙ্গল ও সিলেট, দ্বিতীয় জোনে রয়েছে- ঢাকা নগরী, রংপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও দিনাজপুর এবং তৃতীয় জোনে রয়েছে- বরিশাল বিভাগ, রাজশাহী ও পাবনা। বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে ঝুকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সিলেট জেলাকে। গত ৭ বছরে সিলেটে প্রায় ২০০ বার মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে। ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে, ভূমিকম্পের জন্য অত্যন্ত উর্বর ক্ষেত্র হচ্ছে ভারতের আসাম। আর ভৌগলিক দিক থেকে সিলেট আসামের খুব কাছাকাছি হওয়ায় এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে ঝুকিপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ১৮৯৭ সালেই এই এলাকায় পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শক্তিশালী ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল। এই ভূমিকম্পের বিস্তৃতি ছিল ২০০০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ জুড়ে। সেই ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সিলেট। ভারতের ভূ-বিজ্ঞানী ড. নেন্সি এক সমীক্ষায় বলেন যে, আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম, শিলং, মেঘালয়, কলকাতা এবং বাংলাদেশের সিলেট ও চট্টগ্রাম একটি ভয়াবহ ভূমিকম্পের আশংকায় আছে। এই ভূমিকম্প দেখা দিলে বাংলাদেশের সিলেটের শহরাঞ্চল দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা এই এলাকার ৯৮ ভাগ ভবন মালিকই বিল্ডিং কোড অমান্য করে ও মাটি পরীক্ষা না করে বহুতল ভবনগুলোর কার্য সম্পাদন করেছেন। ১৮৯৭ সালের ভুমিকম্পে সিলেটের ৯১ শতাংশ ঘর বাড়িই বিধ্বস্ত হয়েছিল। আগত ভূমিকম্পে চট্টগ্রামও অনুরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হবে। ১৯৮০ সালের পূর্বে চট্টগ্রামে যে সকল বিল্ডিংগুলো গড়ে উঠেছিল তার অধিকাংশই ধ্বংস হবার সম্ভাবনা রয়েছে যদি মাঝারি ধরণেরও ভূমিকম্প হয়। আর এই বিধ্বস্ততার কারণে প্রান হারাবে অনেক লোক। ১৯৯৯ সালের ২২ শে জুলাই কক্সবাজারের মহেশখালী দ্বীপে দফায় দফায় ভূমিকম্পের কারণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। রিক্টার স্কেলে ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৫.২ । এতে ৩’শ টি কাচাঁঘর বিধ্বস্ত হয়, ৭ জন নিহত হয় এবং আহত হয় দুই শতাধিক। কয়েক দিনের ব্যবধানে মহেশখালীতে ৪টি ভুমিকম্প সংঘটিত হয়। ২০০১ সালে খোদ চট্টগ্রামেই ৪০বার মাঝারি ধরণের ভূমিকম্প হয়েছে। ১৯৫৫ সালে ৬.৫ ম্যাগনিচুটের সর্বশেষ বড় ভূমিকম্পটি হয়েছিল রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানের কাছাকাছি মায়ানমার ও বাংলাদেশ সীমান্তের আশপাশে। ভূমিকম্পটি হওয়ার ৫৩ বছর পর কলাবুনিয়াতে ৫.১ ম্যাগনিচুটের ভুমিকম্প হয়েছে। ড. আফতাব খানের মতে, এই ভূমিকম্পটি প্রমাণ করে আগামী

২০০৫ সালের মধ্যে দেশে ৬.৫ ম্যাগনিচুটের ভূমিকম্প হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আবার ড. আনসারী বলেন, 'যেসব ফল্ট লাইন বাংলাদেশে রয়েছে সেগুলো এখন চুপচাপ আছে। কিন্তু এগুলোর নিয়ম হচ্ছে কিছুদিন পর পর শক্তি সঞ্চয় করা। সারা বিশ্বে এরকম ১০-১৫টি ফল্ট লাইন রয়েছে। ভূমিকম্প হলে যে জায়গা দিয়ে শক্তি বের হওয়ার চেষ্টা করে তাকে ফল্ট লাইন বলে। ভূমিকম্প হলে এই ফল্ট লইন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেদিক থেকে বাংলাদেশ ৩টি ফল্ট জোনের আওতায় পড়েছে। সেজন্য এদেশে যে কোন সময়ই ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে। চট্টগ্রাম বাংলাদেশের প্রথম ফল্ট জোনে পড়েছে। গত ১৯ মাসে চট্টগ্রামে ৫৯ বার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। ২৭ জুলাই ২০০৩ তারিখে রাঙ্গামাটিতে অল্প সময়ের ব্যবধানে ৪ বার ভূমিকম্প হয়ে যায়। এটির মাত্রা ছিল রিক্টার স্কেলে সর্বোচ্চ ৫.০৯ ম্যাগনিচুট। মাঝারি ধরনের এই ভূমিকম্পটির কারণে সেখানকার দুইজন লোকের মৃত্যু হয়। এছাড়াও চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর দেয়ালে ৫১ টি ফাটলের সৃষ্টি হয় । মদুনঘাটার ৬০ টন ওজনের একটি ট্রান্সমিটার বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। কক্সবাজার ও রাঙ্গামাটির কয়েকটি পাহাড়ের গায়ে বড় বড় ফাটল সৃষ্টিসহ কয়েকটি স্থাপনায়ও ফাটলের সৃষ্টি করে। এ ভূমিকম্পে মাত্রা তেমন বেশি না হলেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ একবারে কম নয় । এই ভূমিকম্পটি থেকে ভবিষ্যতে বড় রকমের ভূমিকম্পের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

ভূমিকম্পে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে রাজধানী ঢাকা শহর। পৃথিবীতে কয়েকটি শহরকে ভুমিকম্পের সর্বাধিক ঝুকিপূর্ণ শহর হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে-তেহরান, ঢাকা, আক্রা, বুখারেস্ট, আলজিয়ার্স, বোগোটা, গিজা, কিরগিজ, গোদেলজারো, গুমরি, কাম্পালা, কাঠমুন্ডু, কিমপ্রি, কুইটো, বোম, আসানসুয়ান, সানসালভাদর, সান্টিয়াগো, স্কোপেজ ও সোফিয়া। Urban sizemic risk round the World নামের একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ঝুকিপূর্ণ শহরগুলিকে নির্বাচিত করা হয়েছে। নির্বাচিত শহরগুলির মধ্যে ক্ষয়ক্ষতির দিক থেকে তেহরান ও ঢাকা যুগ্মভাবে প্রথম হয়। নির্বাচিত শহরগুলোতে ভুমিকম্পের প্রবণতা কিরূপ, মূলত এই তথ্য বের করার জন্য আন্তর্জতিক দুর্যোগ ফোরামের উদ্যোগে জরিপ কাজ চালানো হয়। ভূমিকম্প হলে কি ধরণের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে, বিল্ডিং কোড মানা হচ্ছে কি না, জনসংখ্যা কিরূপ, ভূমিকম্পের প্রবণতা, শহরে বাসাবাড়ির সংখ্যা ইত্যাদি তথ্যের ভিত্তিতে এ জরিপ কাজ চালানো হয়। এ তথ্য মোতাবেক নির্বাচিত শহরগুলোর মধ্যে ঢাকা ও তেহরান সবচেয়ে খারাপ শহর। এর মধ্যে ঢাকায় ভূমিকম্পের জন্য তেমন কোন পূর্ব প্রস্তুতি নেই যা তেহরানে আছে। ঢাকার অবস্থা এমনি যে, একটা মাঝারি ধরনের ভূমিকম্প ঢাকা শহরকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করতে পারে। সবদিক বিবেচনা করে প্রমাণিত হয় যে, ঢাকা শহরই বিশ্বের মধ্যে ঝুকিপূর্ণ শহর। ঢাকা শহরকে কেন অধিক ভূমিকম্প ঝুকিপূর্ণ শহর বলা হচ্ছে তা বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, নতুন ঢাকাতে যেসব বিল্ডিং রয়েছে তার ৫০ শতাংশই বিল্ডিং কোড না মেনে তৈরী করা হয়েছে। পুরন ঢাকাতে এই হার দাড়িয়েছে ৯০ শতাংশে। আর নতুন ঢাকায় এপার্টমেন্ট কোম্পানীগুলোর মাত্র ১৫ শতাংশ বিল্ডিং কোড মেনে বাড়ি তৈরী করা হয়েছে।

একটি সূত্র থেকে জানা যায়, ঢাকা শহরে যারা ঘরবাড়ি তৈরী করেন তাদের বেশির ভাগই অদক্ষ রাজমিস্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে করেন। বিজ্ঞানীরা আশংকা করছেন যে, এ ধরনের ঘরবাড়ি প্রথম ধাক্কতেই বিধ্বস্ত হবে। তবে ২০০০ সালের পর যারা বহুতল ভবন তৈরী করছেন তাদের অনেকেই বিল্ডিং কোড মেনে করছেন। যার কারণে সেগুলো তুলনামূলকভাবে নিরাপদ বাড়ি। এপার্টমেন্ট কোম্পানীগুলোর সম্প্রতি তৈরী এপার্টমেন্ট হাউসগুলোও বেশ নিরাপদ। বিল্ডিং কোড কি? এসম্পর্কে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আনসারী বলেন - 'বিল্ডিং কোড হলো একটি বাড়ি বানানোর সম্পূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা। একটি বাড়ি তৈরীর মূল উপাদান থেকে শুরু করে একটি বাড়ি তৈরীর পরে কি লাগবে এমনকি আগুন লাগলে কি করতে হবে, বাতাসের বিপক্ষে কি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিতে হবে তা পর্যন্ত বলা আছে এই কোডে। উল্লেখ্যযোগ্য ব্যাপার হলো, ভূমিকম্পের বিরুদ্ধে কি ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিতে হবে তাও আলাদা করে এই নীতিমালায় বলা হয়েছে। ভূমিকম্পের জন্য এই কোড মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। ভূমিকম্পের জন্য বিল্ডিংয়ের কোন জায়গায় কি ধরনের রড ব্যবহার করতে হবে তাও এখানে বলা আছে'। সম্প্রতি ঢাকা শহরের বিভিন্ন বাসাবাড়ির উপর বুয়েটের পক্ষ থেকে এক জরিপ চালানো হয়। তা থেকে জানা জানা যায় যে, ঢাকাতে সুউচ্চ ভবন আছে ৩০০ টি, ৭-৯ তলা ভবন আছে ৮০০ টির বেশি। আশংকা করা হচ্ছে ভূমিকম্পে এই ভবনগুলোই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর কারণ হচ্ছে এই ভবনগুলোতে বিল্ডিং কোড অনুসরণ করা হয়নি, ম্যাপ ইঞ্জিনিয়ার ও ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা বাড়ি তৈরী করা হয়নি এবং সেখানের মাটিও উক্ত বিল্ডিং এর জন্য উপযুক্ত নয়। ১৯৯৭ সালে শাহাজাহানপুরের ৬ তলা ভবনটি ভেঙ্গে পড়েছিল সেখানকার মাটি পরীক্ষা না করে বাড়ি তৈরীর কারণে। কলাবাগানে ১৯৯৬ সালে নিম্নমানের উপকরণ ব্যহারের কারণে একটি ভবন ভেঙ্গে পড়ে। আবার পুরন ঢাকাতে যেসব বিল্ডিংগুলো রয়েছে সেগুলোতে ভূমিকম্প প্রতিরোধের জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সেখানে অনেক রাস্তা আছে যেখানে পাশাপাশি দুজন মানুষও হাটতে পারেনা। এসব বাড়িঘর ভূমিকম্পের প্রথম ধাক্কাতেই ভেঙ্গে পড়বে। আর এক সূত্র থেকে জানা যায় যে, ১৯৯৩ সালের বিল্ডিং কোড এখনও সরকারের অনুমোদন পায়নি। আর এ নীতিমালা যদি অনুমোদন পায় তাহলে সেটা যুগের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মেটাতে পারবে না। এজন্য বুয়েটের পক্ষ থেকে

সেটি পরিমার্জনের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং রাজউকের পক্ষ থেকে নতুন নীতিমালা তৈরীর কাজ চলছে বলে একটি সূত্রে জানা গেছে। ধারনা করা হচ্ছে ঢাকা শহরে ৬ ম্যাগনিচুটের একটি মাঝারি ভূমিকম্পের কারণে ৪০ শতাংশ বাড়িঘর বিধ্বস্ত হবে, অসংখ্য প্রানহানি ঘটবে এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমান দাড়াবে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকার। ১৯৯৬ সালে ঢাকা থেকে ৭ কি:মি দুরে মানিকগঞ্জে ৭.৫ ম্যাগনিচুটের একটা ভূমিকম্প হয় এবং ২০০০ সালে ঢাকার কাছাকাছি ৪.৮ ম্যাগনিচুটের আর একটি ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল। আর ভূমিকম্পর প্রবণতা হলো ফিরে ফিরে আসা। সুতরাং, ঢাকাতে যে আর একটি বড় ধরনের ভূমিকম্প হবে সে কথা প্রায় নিশ্চিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঢাকার রামপুরা, গাবতলী, মিরপুর, বাড্ডা , পান্থপথ ও তুরাগ নদীর এলাকা ভূমিকম্পের জন্য সবচেয়ে ঝুকিপ্রবণ এলাকা। ভূ-গর্ভস্থ আলোড়নের ফলে ঢাকার মাটি দিন দিন মাটির নিচে ডেবে যাচ্ছে। ফলে নিম্নাঞ্চলের আয়তনও বাড়ছে। এক পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে, তুরাগ নদী ও মিরপুরের আশেপাশের নিচু অঞ্চল প্রতি বছর ০.৯৬ মিলিমিটার করে ডেবে যাচ্ছে। ০.৬ মিলিমিটার করে ডেবে যাচ্ছে রামপুরার গজারিয়া খালের দক্ষিণ পাশ এবং টেলিভিশন ভবন সংলগ্ন দক্ষিণ পাশ। এ বিষয়ে ড. আনসারী বলেন, 'আগে ঢাকা শহরের মাটিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতাম। ভাল মাটি আর খারাপ মাটি। কিন্তু বর্তমানে আমরা ৩০০ রকম মাটির উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। তার মধ্যে আমরা বুয়েট থেকে এক'শ ফুট মাটির নিচে থেকেও উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। একজন জাপানি গবেষকের সাহায্যে আমরা এই উপাত্তগুলো বিশ্লেষণ করেছি। এই বিশ্লেষণের ফলাফল থেকে আমরা ঢাকা শহরকে মাটির দিক থেকে তিনটি জোনে ভাগ করেছি। যেমন- ক) খুব খারাপ বা ভয়াবহ জোন- এখানের মাটি একদমই ভালনা। এই জোনে বহুতল ভবন তৈরী করা ঠিক নয় খ) মাঝারি ঝুকিপূর্ণ জোন- এখানের মাটি তুলনামূলকভাবে কিছুটা ভাল। অপরিকল্পিতভাবে বহুতল ভবন তৈরী করা ঝুকিপূর্ণ গ) কম ঝুকিপূর্ন জোন- তুলনামূলকভাবে এখানকার মাটি ভাল। তারপরেও অবশ্যই বিল্ডিং কোড মেনে বাড়ি তৈরী করা উচিত'। এক প্রশ্নের জবাবে ড. আফতাব বলেন, ' ঢাকা শহরে ২০১৮ সালের মধ্যে ৭.৫ ম্যাগনিচুটের ভূমিকম্প হতে পারে। এটি ইনটেনসিটির ৯-১০ মাত্রা হতে পারে। এর ফলে ঢাকা শহরের বাড়িঘর ভেঙে পড়বে, মাটিতে বড় বড় ফাটল সৃষ্টি হবে। স্থাপনাসমূহ পানিতে তলিয়ে যাবে। ড. আফতাবের এরূপ ধারণার কারণ হচ্ছে, এদেশের ভূমিকম্পের চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেশীয় বিশেষজ্ঞরা একটি সূত্র বের করেছেন তা হলো- ৭ এবং ৭ এর বেশি ম্যাগনিচুটের ভূমিকম্পের প্রত্যাবর্তনকাল ১০০বছর, ৬ থেকে ৭ ম্যাগনিচুটের ৫০বছর, ৫ থেকে ৬ ম্যাগনিচুটের ১০বছর এবং এর নিচে দেড় বছর পর পর ফিরে আসে। সতুরাং, ১৯১৮ সালে সিলেটের শ্রীমঙ্গল জেলায় ৭.৫ ম্যাগনিচুটের যে ভূমিকম্পটি সংঘটিত হয়েছিল সূত্রমতে তা ২০১৮ সালের মধ্যে ফিরে আসতে পারে। ড. আনসারীর মতে, ৮ ইনটেনসিটির একটি ভূমিকম্প সংঘটিত হলে ঢাকা শহরের ক্ষতির পরিমাণ দাড়াবে বিশাল, যেমন- নিহত হবে ২৮১০০ জন, আহত হবে ১০৭০০০ জন, নতুন গৃহ ৪৭৮৭৭ টি, মধ্যম ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ ৭৬৬০০ টি এবং স্বল্প ক্ষতিগ্রস্ত গৃহের সংখ্যা হবে ২৯০০০টি।

বাংলাদেশ ভূমিকম্পের দিক থেকে এত ঝুকিপ্রবণ দেশ হওয়া সত্বেও সরকারীভাবে এই ভুমিকম্পের তীব্রতা মাপার জন্য কোন পরিমাপক যন্ত্র নাই। চট্টগ্রামে যে পরিমাপক যন্ত্রটি বসানো হয়েছিল তাও দীর্ঘদিন ধরে নষ্ট। তবে এ বছর জুলাই মাসে সরকারী উদ্যোগে মাটিতে ভূমিকম্পের প্রভাব পরিমাপের জন্য ৬টি যন্ত্র বসানো হয়েছে। যার ১টি বুয়েটে, ১টি গাজীপুরে, ১টি ময়মনসিংহে, ১টি যমুনা সেতুর দুই তীরে, ১টি নাটোরে এবং ১টি বগুড়াতে। এই যন্ত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে ড. আনসারী বলেন, 'বাংলাদেশের মাঝখানে যদি কোন ভুমিকম্প হয় তাহলে এই যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো ঐ ভুমিকম্পের ঝাকুনি কতখানি হচ্ছে। এর ফলে আমরা এমন সব বাড়ি তৈরী করব যা এই ঝাকুনি সহ্য করতে পারে'। এছাড়াও বেসরকারী পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিভাগে ড. আফতাব আলম খান ১টি মিসমোগ্রাফ যন্ত্র বসিয়েছেন যার দ্বারা ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপা যাবে। কিন্তু এর জন্য ন্যুনতম তিনটি যন্ত্রের প্রয়োজন যার দ্বারা ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নির্ধারণ করা যায়। বাকি ২টি আনার উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান। ড. আফতাব বলেন, 'যতো বেশি যন্ত্র থাকবে ততো বেশি আমরা ভূমিকম্পের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারবো এবং তা থেকে আমরা মোটামুটি সতর্কবানী দিতে পারবো'।

ভূমিকম্প রোধ করা সম্ভব নয় তবে ভূমিকম্পের ক্ষতি থেকে অনেকটা রেহাই পাওয়া যেত যদি এর পূর্বাভাস তৈরী করা সম্ভব হত। বর্তমান বিশ্বের বিজ্ঞানীরা এই পূর্বাভাস তৈরীর জন্য ব্যাপক গবেষণা চালাচ্ছেন। এ প্রয়াসে বিজ্ঞানীদের সর্বশেষ সংযোজন হলো কোয়েকস্যাট নামে একটি ক্ষুদ্রকার স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে প্রেরণ। এ উপগ্রহটির আকার হচ্ছে ৪ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি। নাসার এক খবর থেকে জানা যায়, গত ৩০/০৬/০৩ ইং তারিখে কোয়েকফাইন্ডার নামে একটি কোম্পানী এই উপগ্রহটি পৃথিবীর আকাশে ছেড়েছে। এটি পৃথিবীর আকাশে ১বছর অবস্থান করবে। এ ক্ষুদ্র উপগ্রহটির ট্র্যাক রাখছে নোরাড নামে একটি উপগ্রহ। কোয়েকস্যাট ভূ-গর্ভের গভীরে টেকনিক তৎপরতার ফলে সৃষ্ট চুম্বক শক্তিগুলো (ম্যাগনেটিক সিগন্যাল) ধরে রেকর্ড করেছে। তবে তার সঙ্কেতগুলো খুব ক্ষীণ। তার অস্থিরতা বিজ্ঞানীদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একে তারা এক্সট্রিমলি লো-ফ্রিকোয়েন্সি (ই.এল.এফ) বলে অভিহিত করে থাকেন। মোটামুটি কোয়েকস্যাটের প্রধান কাজ হচ্ছে ভূকম্পনের আগে ও পরে চুম্বক সঙ্কেত

সনাক্ত করা। নাসার বিজ্ঞান বিষয়ক এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিজ্ঞানীরা আশা করছেন কোয়েকস্যাটের মাধ্যমে ভূমিকম্পের সঙ্কেতগুলো রেকর্ড করে পূর্বাভাস সৃষ্টি করা সম্ভব হতে পারে। তবে এটা তাদের কল্পনা। ১৯৯৮ সালে যখন জাংবেইর ভূমিকম্প ঘটে তখন তাপক স্বভাবিক থেকে ৬ - ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস পার্থক্য ঘটেছিল। কৃত্রিম উপগ্রহগুলো তো ইনফ্রায়েড রেডিয়েশন ক্যামেরা যুক্ত করে দিলে তা আকাশ থেকে উষ্ণ স্থানগুলো সনাক্ত করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, গত ২০০১ সালের ২৬ জানুয়ারী ভারতের গুজরাট রাজ্যের ভুজে প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পের পর বিভিন্ন উপগ্রহ থেকে সংগৃহীত উপাত্তগুলো পরীক্ষা করে প্রফেসর ফ্রিয়েড ও সহগবেষকরা লক্ষ্য করেন যে, কম্পনের আগে থেকে সেখানকার ভূমি ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছিল। কম্পনের দিন তাপীয় বিশৃঙ্খলা ছিল +৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দুর্যোগের ৫ দিন আগের ইনফ্রারেড ইমেজটি পরীক্ষা করে কম্পনের উৎসস্থল কোনটি হবে তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। চুম্বক সঙ্কেত ও ইফ্রারেড রেডিয়েশন দ্বারা ভূকম্পনের পূর্বাভাস প্রদান পদ্ধতি এখনও বিতর্ক মুক্ত নয়। তবে মনে করা হচ্ছে মানুষ একদিন সফল হবে তার প্রয়াসে।

'হুঁশ থাকতে মরণ নাই' গ্রাম এলাকায় আজও এ প্রবাদটি প্রচলিত আছে। আমাদের এই গরীব দেশটি জ্ঞান বিজ্ঞানের দিক থেকে এখনও অনেক পিছিয়ে থাকলেও ঝুকিপূর্ণ দেশ হিসেবে অনেক এগিয়ে। সেক্ষেত্রে আমরা একটু সচেতন হলেই অনেকটা ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পেতে পারি। ভূমিকম্পের ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়ার কিছু টিপ্স নিচে দেওয়া হলো;

ক) সর্বপ্রথমে ভূমিকম্প সম্পর্কে জানতে হবে এবং পরিবারের সবাইকে ভূমিকম্প সম্পর্কে সচেতন করতে হবে খ) এরপরে বাড়ি করার জন্য নির্বাচিত জায়গার মাটি পরীক্ষা করে নিতে হবে যে, সেখানকার মাটি ডেবে যাওয়ার প্রবণতা আছে কি না গ) দক্ষ প্রকৌশলী দিয়ে বাড়ির নকশা তৈরী ও তদারকি করতে হবে ঘ) বিল্ডিং কোড অনুযায়ী রড ব্যবহার করতে হবে যা ভূমিকম্পের ধাক্কায় সহনশীল হবে ঙ) ভাল মানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করতে হবে চ) গ্রেট বিম কলামের সংযোস্থলে কোড অনুযায়ী রড ব্যবহার করতে হবে ছ) কলামের রডে বাধঁনগুলোর শেষ মাথা ১৩৫ ডিগ্রি হতে হবে এবং বাধঁনগুলোর দূরত্ব অন্য জায়গার চেয়ে অধৃক হবে জ) বিম কলামের সংযোগ স্থলে জোড়া লাগানো যাবেনা, নতুন পুরনো সংযোগগুলো কলামের মাঝামাঝি কোন জায়গায় হবে এবং সংযোগগুলো ঝালাই করা যায় এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে ঝ) পাশের বাড়ি থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরে বাড়ি তৈরী করতে হবে যাতে অন্যের ক্ষয়ক্ষতির সাথে নিজেকেও ক্ষতির শিকার না হতে হয় ঞ) বাড়ির বৈদ্যতিক লাইন, গ্যাস লাইন অত্যন্ত সতর্ক ও নিরাপদভাবে স্থাপন করতে হবে ট) পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী হেলমেট কিনে রাখলে ভাল হয় ঠ) খাট, টেবিল ইত্যাদি শক্ত করে তৈরী করতে হবে যাতে বিপদের সময় তার নিচে আশ্রয় নেওয়া যায় এবং ড) ঘরে একাধিক দরজা রাখার দরকার যাতে ভূমিকম্প হলে দ্রুত বের হওয়া যায়। এ টিপ্সগুলো অনুসরণ করলে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়া। তবে যারা অপরিকল্পিত ভাবে বাড়ি তৈরী করে ফেলেছে তাদের জন্যও কিছু টিপ্স রয়েছে, যেমন- ক) বাড়ির কলামগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে, প্রয়োজনমত কলামের আকৃতি বাড়াতে হবে, তবে এটা ভিত্তি থেকেই বড়ানোর চেষ্টা করতে হবে খ) দেয়ালকে মজবুত করার জন্য ব্রেসি বা ✕ এর মত বন্ধনী পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে গ) বিম বা নিচ থেকে আনুভুমিক ব্রেসি দেওয়া যেতে পারে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোনাকুনি ব্রেসিং দেওয়া যেতে পারে ঘ) প্রয়োজনে নতুন করে মাটি পরীক্ষা করে নিতে হবে, বিল্ডিং ডেবে যাওয়ার ভয় থাকলে দ্রুত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ঙ) দেওয়াল মজবুত করার জন্য দরজা জানালার স্থানে দুই দিকে খাড়া রড এবং ইটের দেয়ালের মাঝখানে অতিরিক্ত রড দিয়ে দিতে হবে চ) প্রত্যেক কক্ষের কোনায় খাড়াভাবে অতিরিক্ত কংক্রিটের কলম ইস্পাতের রডসহ নির্মাণ করা যায়, টানা লিন্টেন না থাকলে নতুন করে তা দেওয়া যায় ছ) কাচাঁ বাড়িঘর, বাঁশের ঘর হলে বাঁশের বেড়ার দু'পাশে মাটি বা চুনসুরকির প্রলেপ দেওয়া যেতে পারে।

ভূমিকম্প শুরু হলে যা করতে হবে-
ক) ভূমিকম্পের প্রথম ঝাকুনির সাথে সাথে পরিবারের সবাইকে নিয়ে সম্ভব হলে প্রতিবেশীদেরকেও সঙ্গে নিয়ে বাইরের খোলা জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে খ) পরিবারের সবাইকে হেলমেটগুলো পরে ফেলতে হবে গ) দ্রুত বৈদ্যতিক সুইচ ও গ্যাসের সুইচ বন্ধ করতে হবে ঘ) কোন কিছু সঙ্গে নেওয়ার জন্য অযথা সময় নষ্ট করা উচিত হবে না ঙ) যদি বাড়ি থেকে বের হওয়া সম্ভব না হয় তবে ইটের ঘর হলে ঘরের কোনায় আর কলাম ও বিমের তৈরী ভবন হলে কলামের গোড়ায় আশ্রয় নিতে হবে চ) বাসস্থান আধাপাকা বা সম্পূর্ণ টিনের তৈরী হলে তা থেকে যদি বের হওয়া না যায় তবে ঘরের টেবিল এবং খাটের নিচে আশ্রয় নিতে হবে ছ) যদি রাত্রে ভূমিকম্প হয় তবে তবে ইটের ঘর হলে ঘরের কোনায় আর কলাম ও বিমের তৈরী ভবন হলে কলামের গোড়ায় আশ্রয় নিতে হবে জ) ভুকিম্পের সময় ব্রিজের উপর গাড়ি পার্কিং করা যাবেনা ঝ) এ সময় লিফট ব্যবহার করা ঠিক নয় এবং ঞ) ভূমিকম্পের সময় মনোবল হারানো যাবেনা, সর্বসময়ই স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করতে হবে।

এসব টিপ্সগুলো অনুসরণ করলে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি থেকে অনেকটা বাঁচা সম্ভব হবে।

তথ্য সূত্র ঃ

১। দুর্যোগ তথ্য কেন্দ্র, সিডিপি, ৫৫/২ ইসলামপুর রোড, খুলনা।
২। দুর্যোগ প্রতিবেদন-১৯৯৯, বাংলাদেশ দুর্যোগ প্রস্তুতি ফোরাম, ঢাকা।
৩। দুর্যোগ প্রতিবেদন-২০০০, বাংলাদেশ দুর্যোগ প্রস্তুতি ফোরাম, ঢাকা।
৪। দুর্যোগ প্রতিবেদন-২০০১, বাংলাদেশ দুর্যোগ প্রস্তুতি ফোরাম, ঢাকা।
৫। দুর্যোগ প্রতিবেদন-২০০২, বাংলাদেশ দুর্যোগ প্রস্তুতি ফোরাম, ঢাকা।
৬। পরিবেশ পত্র - বর্ষ ৫, সংখ্যা ১-২, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর-২০০১, উন্নয়ন সমন্বয়, ঢাকা।
৭। পরিবেশ পত্র - বর্ষ ৬, সংখ্যা ১, এপ্রিল-জুন-২০০২, উন্নয়ন সমন্বয়, ঢাকা।
৮। উচ্চ মাধ্যমিক ভূগোল (প্রথম পত্র) - শেখ নুরুদ্দীন
৯। দৈনিক সংবাদ- ৩০ ও ৩১ শে জুলাই ২০০৩, দৈনিক জনকণ্ঠ- ২৮, ২৯ ও ৩১ শে জুলাই ২০০৩, দৈনিক জনকণ্ঠ-৩ ও ১৯ শে আগস্ট, দৈনিক প্রথম আলো-২৮ ও ২৯ শে জুলাই ২০০৩, দৈনিক প্রথম আলো- ৬ আগস্ট ২০০৩, দৈনিক প্রথম আলো-২ সেপ্টেম্বর ২০০৩, দৈনিক ভোরের কাগজ-১৫ জুন ২০০৩, দৈনিক ভোরের কাগজ-২১ আগস্ট ২০০৩, দৈনিক ভোরের কাগজ-১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩।

লেখকঃ এম এম মাহবুব হাসান

রিসোর্স সেন্টার ম্যানেজার

তৃণমূল অংশীদারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প, উপকূলীয় উন্নয়ন সহযোগী (সিডিপি)

৫৫/২ ইসলামপুর রোড, খুলনা-৯১০০

ই-মেইল : mahbub_kbd@hotmail.com OR mahbub_cdp@yahoo.co.uk